গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৫ অক্টোবর ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম এত বেশি কেন

গত ২৪ বছরে এ দেশে পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়েছে ৬৮ বার, গড়ে বছরে প্রায় ৩ বার। সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকার এই রেকর্ড প্রায় ভেঙে দেওয়ার মুখে। এদের দু-মাসের রাজত্বে ইতিমধ্যেই দু-বার পেট্রল-ডিজেল, একবার রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের দাম বেড়েছে এবং শোনা যাচ্ছে আবার নাকি রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের দাম বাড়বে। গ্যাস সিলিন্ডারের সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকাও নাকি প্রায় দ্বিগুণ করা হবে। এছাড়া তেল কোম্পানিগুলিকে এই অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি পনের দিন অন্তর তারা তেলের দামের পর্যালোচনা করতে পারবে এবং প্রয়োজনে দশ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি করতে পারবে। এর সুযোগ নিয়ে এইসব তেল কোম্পানি আরও কতবার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াবে তা ভবিষ্যতেই আমরা দেখতে পাব।

তেলের অস্বাভাবিক এই মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রতিবারই বুর্জোয়া রাজনীতির একটা নোংরা খেলা আমরা দেখতে পাই। বিজেপি সরকার দাম বৃদ্ধি করলে কংগ্রেস হুংকার ছাড়ে, কংগ্রেস বাড়ালে বিজেপি বিরোধিতার ভান করে। এই খেলা এবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কংগ্রেস সরকারের তেলের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিজেপি সরব হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বসে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের হুংকার দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যমগুলিতে ফলাও করে তা ছাপা হয়েছে। সিপিএমের ভূমিকাও প্রতারণামূলক। কংগ্রেস সরকারের সমস্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্তের তারা একদিকে মন্ত্রণাদাতা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'এইভাবে তেলের দাম বাড়ানো চলবে না' জাতীয় কথা বলে তারা বাজার গরম করার চেষ্টা করছে।

তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বরাবর যে যুক্তি খাড়া করা হয় এবারও সেটাই করা হচ্ছে। যুক্তিটা মোটামুটি এইরকম, ''সরকারের কিছু করিবার নাই, কারণ পেট্রোলিয়ামের জন্য ভারত আমদানি নির্ভর। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়িলে তাহাকে বাড়তি দর গণিয়া দিতেই হইবে। ···নির্মম সত্য ইহাই যে পশ্চিম এশিয়ায় আগুন জ্বলিলে ভারতও তাহাতে পুড়িবে। চিদম্বরম সাফ বলিয়াছেন, তিনি নিরুপায়।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪-৮-২০০৪)

অর্থাৎ (১) আমাদের দেশ আমদানি নির্ভর এবং (২) আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। সুতরাং যা হবার তা হবেই — তেলের দাম বাড়বেই, সরকারের কিছু করার নেই। জনসাধারণের উচিত বিক্ষোভ আন্দোলন না করে একে অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য হিসাবে মেনে নেওয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ক্রমাগত কমতে কমতে যখন ব্যারেল প্রতি ১৬ ডলারে দাঁড়িয়েছিল, তখন এদেশে দাম না কমে কেন বারবার বেড়েছিল? কিংবা সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও পাশের দেশ বাংলাদেশে তেলের দাম আমাদের তুলনায় কেন অনেক কম? বাড়ার পরেও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের যা দাম, কেন

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে এ আই ডি এস ও'র বিশাল ছাত্রমিছিল

দাবি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষার সর্বস্তরে অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন ফি, শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে এবং ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা এবং প্রতিটি ছাত্রের শিক্ষার অবাধ সুযোগের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র আহ্বানে ২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এক ঐতিহাসিক ছাত্র-বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানত উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজ্যগুলি যথা পাঞ্জাব, চন্ডীগড়, হরিয়ানা, দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় ও বিহার থেকে দশ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী এই বিক্ষোভে সামিল হয়। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র ৫০ বৎসর পূর্তিতে সংগঠনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বহন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে স্তরে স্তরে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস ধরে আন্দোলন গড়ে তুলে সেই ধারাবাহিকতাতেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লির মিন্টো ব্রিজ পার হয়ে সংসদ অভিমুখে ছাত্রমিছিল

মেডিক্যালে ছাত্র আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য জয়

কোর্টের রায়ে ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ভর্তি বাতিল

মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষা এড়িয়ে সওয়া নয় লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে, অনাবাসী ভারতীয় এবং ম্যানেজমেন্ট কোটায় ১০৫ জনকে রাজ্য সরকার ডাক্তারি কোর্সে ভর্তি করে নিয়েছিল। রাজ্য সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সংগঠিত করে দফায় দফায় আন্দোলন গড়ে তোলে, আদালত পর্যন্ত আন্দোলনকে নিয়ে যায়। ২৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায়ে রাজ্য সরকারের ভর্তির সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে গিয়েছে। হাইকোর্ট অবিলম্বে ক্যাপিটেশন ফি ফেরত দেবার নির্দেশ দিয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের এই উল্লেখযোগ্য জয়ে বিব্রত সিপিএম ফ্রন্ট সরকার তাদের বৈষম্যমূলক ও অন্যায় সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সমর্থন আদায় করতে সুপ্রিম কোর্টে দৌড়েছে।

গত বছর রাজ্য সরকার মেডিকেল শিক্ষায় বেতন ও হোস্টেল চার্জ বিপুলভাবে বাড়াবার চেষ্টা করায় এ আই ডি এস ও রাজ্যব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার বর্ধিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর ৬ অক্টোবরের মহামিছিল প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বাতিল করা হয়।

চাল চুরির প্রতিবাদ করায় সি পি এমের বর্বর হামলা

১২ ঘন্টার রায়দীঘি বন্‌ধ

লক্ষ লক্ষ টাকার চাল চুরি, চুরির অপরাধ ঢাকতে সি পি এমের নির্লজ্জ অপচেষ্টা, প্রতিবাদী মানুষদের উপর এবং বিডিও-র উপস্থিতিতে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনারত এস ইউ সি আই নেতাদের উপর সি পি এম দুষ্কৃতীদের নৃশংস হামলার প্রতিবাদে এস ইউ সি আইয়ের ডাকে ১ অক্টোবর ১২ ঘণ্টা রায়দীঘি বন্‌ধ অভূতপূর্ব-ভাবে সফল হয়েছে। বন্‌ধের দিন নদীবহুল রায়দীঘি থানার খেয়াঘাট নিস্তরঙ্গ ছিল; ভুটভুটি চলেনি। বেশিরভাগ স্কুল-কলেজ, হাটবাজার বন্ধ ছিল। সবরকম চেষ্টা ও ত্রাস সৃষ্টি করেও সিপিএম বন্‌ধ ভাঙতে পারেনি। বিকৃত বামপন্থা যে কতদূর অমানবিক ও কতটা কুৎসিত হতে পারে তার নিদর্শন হয়ে রইল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রায়দীঘি ব্লকে সি পি এমের তাণ্ডব।

এলাকার বিধায়ক সি পি এম মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি, পঞ্চায়েত সমিতিও সি পি এম দখল করেছে। ফলে এলাকায় সি পি এমের একাধিপত্য। তা সত্ত্বেও মাসের পর মাস মিড-ডে মিল, এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের চাল অমিল।

দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চাল দেওয়া হচ্ছে না। ব্লকের রিলিফ অফিসাররা ডিলারদের হাতে সরকারি আদেশনামা দিলেও ডিলাররা খাঁড়াপাড়া সমবায় গোডাউনে চাল আনতে গিয়ে বারে বারে ফিরে এসেছেন। শাসকদলের প্রতিনিধিরা এবং তাদের অনুগত অফিসাররা জানতেন চাল আসা সত্ত্বেও কেন সরবরাহ হচ্ছে না। খাঁড়াপাড়া সমবায় সমিতির পরিচালক হলেন সি পি এমের আঞ্চলিক শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতা ও বর্তমানে সি পি এম আশ্রিত কিছু কংগ্রেস নেতা। জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের চাল সহ শিশুদের জন্য সরবরাহ করা চাল চুরি করে বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়েছে। আত্মসাৎ করা চালের মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই রায়দীঘি, কঙ্কনদীঘি এবং কাশিনগর এই তিনটি আঞ্চলিক কমিটি মিলিতভাবে আন্দোলনে নেমেছে। এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের চাপে বিডিও গোডাউন সিল করে দেন। এরপর ৪৪২৮ কুইন্টাল চাল চুরির ঘটনা আড়াল করার জন্য মাত্র দু-লরি চাল তারা নিয়ে আসে এবং স্কুলগুলিতে পচা, গুমো, অখাদ্য কিছু চাল পাঠায়।

লরির চাল আটক করা, অপরাধীদের শাস্তি এবং স্কুলে খাওয়ার যোগ্য চাল সরবরাহের দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর মথুরাপুর ২নং ব্লকে এস ইউ সি আইয়ের ডাকে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সনাতন দাস, কঙ্কনদীঘি আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড উত্তম হালদার ও অঞ্চলপ্রধান বিশাখা মণ্ডল, রায়দীঘি পঞ্চায়েতের সদস্য জয়দেব সর্দার ও এলাকার বিশিষ্ট সংগঠক বিজয় হালদার।

ডেপুটেশনের নেতৃবৃন্দ যখন দোতলায় বিডিও-র সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখনই বিডিও অফিসের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকারীদের উপর সি পি এমের কয়েকজন ব্লক ও আঞ্চলিক নেতা সহ প্রায় ৪০/৪৫ জন লাঠিসোঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনগণের মুখ বন্ধ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। বৃদ্ধ ও মহিলাদেরও তারা রেহাই দেয়নি। ষাট বছরের বৃদ্ধ কুমড়াপাড়ার শিবচরণ মণ্ডলের বুকে পা দিয়ে তারা গলা টিপে মারার চেষ্টা করে। ছাত্র কর্মী বাবলু মণ্ডলকে প্রচণ্ড মেরে ড্রেনে ফেলে দেয় এবং মরে গিয়েছে ভেবে উল্লাস করতে থাকে। গিলারছাটের অমরেন্দ্র মণ্ডল, পূর্ব জটার চটিরাম মণ্ডল, কঙ্কনদীঘির উত্তম পাল ও পার্টির জেলা কমিটির সদস্য সনাতন দাস সহ অন্যান্যদের তারা প্রচণ্ড মারধোর করে। আক্রমণকারীরা এক মহিলার শাড়ি খুলে নিয়ে অট্টহাস্য করতে থাকে। মহিলারা দুর্বৃত্তদের পা চেপে ধরলে তারা তাদের মুখে লাথি মারে, ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয় এবং 'বানতলা ধানতলা করে দাও' বলে বীভৎস উল্লাস করতে থাকে। মহিলাদের আতঙ্কে কাঁদতে দেখে আক্রমণকারীরা হাসিতে ফেটে পড়ে। তাদের আক্রমণে পারমিতা দাস, অচলা সরদার, শান্তি কয়াল সহ পাঁচজন মহিলা গুরুতর আহত হন।

সমস্ত ঘটনা ঘটে বিডিও-র সামনে। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রায়দীঘি থানার পুলিশ সমস্ত দেখেও না দেখার ভান করে। ঘটনার দু-ঘণ্টা পর পুলিশ আসে এবং এসেই আক্রান্ত ও আহত এস ইউ সি আই নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে এবং বলে, আহত সিপিএম কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

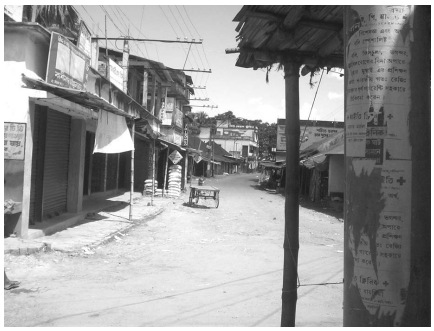

বন্‌ধের দিন রায়দীঘির একটি ব্যস্ত এলাকা

সি পি এমের এই নৃশংস আক্রমণ ও অপরাধীদের পক্ষ নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের এই নির্লজ্জ ভূমিকায় জনমনে প্রবল ক্ষোভ দেখা দেয়। সেই ক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিয়ে চাল চোরদের গ্রেপ্তার, গরিবদের জন্য খাওয়ার যোগ্য চাল সরবরাহের দাবিতে ১ অক্টোবর ১২ ঘণ্টা রায়দীঘি বন্‌ধ-এর ডাক দেয় এস ইউ সি আই। বন্‌ধ ভাঙতে সিপিএম সর্বশক্তি নিয়োগ করে। জবরদস্তি দোকান খোলানো, গাড়ি ও ভুটভুটি চালানোর চেষ্টা তারা চালায়। তারা বলে আজ যারা দোকান, গাড়ি, নৌকা চালানো বন্ধ রাখবে, চিরদিনের মতো তাদের রুজিরোজগার বন্ধ হবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। বিক্ষুব্ধ জনগণ তাদের সাথী প্রতিবাদী এস ইউ সি আইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বন্‌ধ সফল করেন। দলের পক্ষ থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর এবং সেজন্য এলাকায় দলমত নির্বিশেষে গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কুলতলিতে মিড-ডে মিলের চাল চুরির প্রতিবাদ

কুলতলি ব্লকের স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের চাল লোপাট ও এস জি আর ওয়াই প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপের প্রতিবাদে গত ১ অক্টোবর ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এসের পক্ষ থেকে কুলতলি বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে অভিযোগ করা হয় যে, একদিকে যেমন স্কুলগুলিতে দীর্ঘ দিন মিড-ডে মিলের চাল দেওয়া হয়নি, তেমনি এস জি আর ওয়াই প্রকল্পের কাজ শুধু খাতায় কলমে সারা হয়েছে, বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি। সাতদিনের মধ্যে অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বিডিও-কে ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ডি এস ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোষ্ঠ ভুঁঞ্যা।

মেদিনীপুর

বিদ্যুৎ বিল অগ্রিম আদায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

এত দিন কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের মিটার ছিল না, বছরের বিল ১২টি কিস্তিতে ১২ মাসে জমা দিতে হত। এমনিতেই ক্রমাগত বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করায় চাষীরা সংকটে রয়েছে, তার ওপর হঠাৎ বিদ্যুৎ পর্ষদ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের টাকা ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য বিল পাঠিয়েছে। এই অন্যায় ও অযৌক্তিক বিদ্যুৎ বিল আদায়ের প্রতিবাদে ২৮ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)র মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক মধুসূদন মান্নার নেতৃত্বে পুলিন মাইতি, অশোকতরু প্রধান, বিশ্বরূপ অধিকারীকে নিয়ে এক প্রতিনিধিদল বিদ্যুৎ দপ্তরের এই তুঘলকী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

একই দাবিতে কোলাঘাট আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সভাপতি জয়মোহন পালের নেতৃত্বে শঙ্কর মালাকার সহ এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন। বালিচক স্টেশন ম্যানেজার ও মেদিনীপুর সার্কেল ম্যানেজারের কাছেও দাবিগুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন দু'টিতে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি নারায়ণচন্দ্র দাস, অফিস সম্পাদক অমল মাইতি প্রমুখ।

কলকাতা

অনলাইন লটারি বন্ধের দাবিতে বরানগর থানায় ডেপুটেশন

ডি ওয়াই ও, ডি এস ও এবং এম এস এস-এর বরানগর শাখার উদ্যোগে এলাকায় অনলাইন লটারির নামে সরকারি মদতে জুয়া খেলা বন্ধ, মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল, সমগ্র বরানগর জুড়ে পাড়ায় পাড়ায় যে চোলাই মদের ঘাঁটি চলছে তা বন্ধের দাবিতে ২৬ সেপ্টেম্বর বরানগর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করা হয় এবং সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস মঞ্জু চক্রবর্তী, নিবেদিতা ব্যানার্জী, শ্যামলী কর, কৃষ্ণা দে, দিলীপ দাস ও সুপ্রিয় ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বরানগর থানার বিপরীতে ঘোষপাড়া এলাকার মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি আইসক্রিমের দোকানকে 'বার' করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যার বিরুদ্ধে ডি ওয়াই ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা

গাইঘাটায় বন্যাদুর্গত চাষীদের বিদ্যুৎদপ্তর ঘেরাও

চাষীদের মোটরচালিত শ্যালো টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বন্যা কবলিত এলাকায় এই বিল মকুব করার দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর বন্যাদুর্গত প্রায় দেড়শো চাষী গাইঘাটা গ্রুপ সাপ্লাই অফিসের স্টেশন ম্যানেজারকে সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন।

২৭ সেপ্টেম্বর বন্যাদুর্গত চাষীদের বিক্ষোভ

তিনি বিল দেওয়ার মেয়াদ ১৪ দিন বাড়িয়ে দিয়েও বিক্ষোভকারীদের শান্ত করতে পারেননি। শেষে বারাকপুর এস ই'র অফিসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলে বিক্ষোভ প্রত্যাহৃত হয়। এদিনের বিক্ষোভে সামিল হয় — সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি এবং অগভীর নলকূপ কৃষক সমিতি। এই দুই সংগঠনের সম্পাদক স্বপন গোস্বামী এবং সভাপতি দেবদাস বৈদ্য বলেন, দেশের ছ'টি রাজ্যে চাষের ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। আর আমাদের রাজ্য সরকার উত্তরোত্তর তা বাড়িয়ে চলেছে। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার চাষীরা জলে ডুবে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আগাম বিদ্যুৎ-এর বিল জমা দেওয়ার জন্য বিল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব মোটরের ক্ষেত্রে কোনও মিটার নেই। আগে মাসে মাসে বিল দিতে হত। এখন তিন মাসের বিল এক সঙ্গে আগাম দিতে বলা হচ্ছে। এই মাশুল বেশ খানিকটা বাড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় পূর্ব ঘোষণা মতো ১ অক্টোবর তিন শতাধিক কৃষক সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরা করেন।

হাবড়ায় ডি-ই অফিস ঘেরাও

গত ২৮ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়াতে দুই শতাধিক কৃষক তাদের অগ্রিম এককালীন তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, কৃষিতে বিনাপয়সায় বিদ্যুৎ এবং গ্রাহকদের মিটার দেওয়ার দাবিতে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ডি-ই)কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্মারকলিপি দেয়। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক অনুকূল ভদ্র।

সিপিএম নেতৃত্বের কাছে এখন হারাধন রায়ের মত শ্রমিক নেতারা বাসি, অচল

রানিগঞ্জ-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের একদা সিপিআই(এম) দলের প্রবীণ শ্রমিক নেতা হারাধন রায় এখন নিজের দলেই প্রায় অচ্ছ্যুৎ। কোলিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে আগেই সরানো হয়েছিল। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের আবাসস্থল রানিগঞ্জ পার্টি অফিস 'কয়লা ভবন'ও ছাড়তে বাধ্য হলেন তিনি। বিস্তীর্ণ কোলিয়ারি অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার মত এই ভবনটি তৈরির পেছনেও তাঁর অবদান কম ছিল না।

হারাধনবাবু বামপন্থী আন্দোলন তথা সিপিআই দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে। তারপর কয়েক দশক ধরে কোলিয়ারি অঞ্চলে শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে তাদের নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছ'বার বিধায়ক ও তিনবার সাংসদ হিসাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। পার্টি অফিস ছাড়া তাঁর থাকার ব্যক্তিগত আলাদা কোন জায়গাও ছিল না। তাঁকেই আজ নিঃশব্দে চলে যেতে হল। কেন তাঁকে অপসারণ করা হল বা কেন তাঁকে অফিস ছাড়তে হল, আজ পর্যন্ত তার কোন বাখ্যাই সিপিএম নেতৃত্ব জনসমক্ষে দেয়নি। সকলেই জানেন যে, দীর্ঘ বছর ধরে গোটা কোলিয়ারি এলাকা জুড়ে মাফিয়ারাজ কায়েম হয়েছে। বেআইনিভাবে কয়লা তোলা, কয়লা পাচার ইত্যাদি নানা অসামাজিক কার্যকলাপকে মদত দিয়ে চলেছে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা। শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করা হারাধনবাবু মানতে পারেন নি নেতাদের এইসব কার্যকলাপ। তিনি সাধ্যমত এ ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে তার সাথে বিরোধ বেধেছে পার্টি নেতৃত্বের। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই বিরোধ আজ প্রকাশ্যেও এসে গেছে অনেকখানি। পাশাপাশি কোলিয়ারি শিল্পের বেসরকারীকরণের যে নীতিকে সিপিএম আজ প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছে, সেক্ষেত্রেও হারাধনবাবু একটি বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই, পার্টি নেতৃত্ব চাইছিল, সংগঠন থেকে তিনি নিজেই ধীরে ধীরে সরে যান, নিষ্ক্রিয় হয়ে যান এবং তাঁর অস্তিত্ব মুছে যাক। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে তিনি শেষপর্যন্ত পার্টি অফিস তথা সংগঠন ছাড়তে বাধ্য হলেন।

পার্টি তিন দশক ক্ষমতায় থেকে শ্রমিকস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে একনিষ্ঠভাবে মালিকশ্রেণীর সেবা করে যাচ্ছে। ফলে হারাধনবাবুদের মতো সৎ, শ্রমিক আন্দোলনে আপসহীন সংগ্রামী মানুষদের আজ আর পার্টির প্রয়োজন নেই। হারাধনবাবুদের মত বহু কর্মীর ত্যাগ, সততা ও সংগ্রামকে কাজে লাগিয়েই সংসদীয় রাজনীতিতে পার্টি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এখন ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে তাদের প্রয়োজন এমন সমস্ত ব্যক্তিদেরই যারা নানা অবৈধ উপায়ে দলকে নির্বাচনে জেতাতে পারবে, অত্যাচার চালিয়ে, খুন করে বিরোধী কণ্ঠকে রোধ করতে পারবে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই সিপিএম-এর সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্র প্রকাশ্যে এসে গেছে। চরম সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে বাঁচাবার পবিত্র দায়িত্ব তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের ক্ষমতা ও মন্ত্রীত্বের উদগ্র লালসা। এই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতই তারাও আজ জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে মালিকশ্রেণীর টাকার ওপর, আর নির্ভর করছে সমাজের কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের ওপর। তাই বুন্টন - তারকেশ্বর লোহার - পলাশ-দিলীপদের দলে এত কদর। হারধনবাবুরা পার্টি নেতৃত্বের চোখে আজ বাসি, অচল।

হারাধনবাবুদের মতো আরও বহু আদর্শবান কর্মী, যাঁরা আজও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন বুকে বহন করেন, মানুষের শোষণ-নিপীড়ন আজও যাঁদের বিচলিত করে, যাঁরা মনে করেন শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া শোষিত মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়, তাঁরা নেতৃত্বের এই আপসকামিতা মেনে নিতে পারেন নি। এঁদের বেশিরভাগই গভীর ব্যথায়, দুঃখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নীরবে সরে গেছেন দল থেকে। বাকিদের বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু কেন এমন হল? কেন বহু কর্মীর এত আত্মত্যাগ, এত সংগ্রাম সত্ত্বেও তাদের সমস্ত স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল? কেন হারাধনবাবুদের মত সৎ ও সংগ্রামী কর্মীদের আজ দলে আর স্থান নেই?

বাস্তবে নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও, পার্টির রাজনৈতিক লাইন যদি সঠিক না হয়, নীতি যদি সঠিক না হয়, নেতৃত্ব যদি আপসকামী হয়, তবে কর্মীদের যত সততাই থাকুক, যত আত্মদানই থাককু, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমাদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সহস্র প্রাণের আত্মদান সত্ত্বেও সেদিন যে জাতীয়তাবাদী নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের আপসকামীতার জন্য স্বাধীনতার সমস্ত ফল এদেশের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ শোষণের যাঁতাকলে আজও সমানভাবে পিষ্ট হয়ে চলেছে।

একদিন রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনামের লড়াই এদেশের মানুষকে বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাঁচের দশক, ছয়ের দশকের বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর পতাকার লাল রঙ দেখে সেদিন দলে দলে মানুষ কমিউনিস্ট নামধারী দলটির সাথে যুক্ত হয়েছিল। এই দীর্ঘ বামপন্থী আন্দোলনের সমস্ত কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করেই সিপিএম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট সরকার 'সংগ্রামের হাতিয়ার' নাম নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে বিভিন্ন আন্দোলনে শোষণের বিরুদ্ধে গরম গরম স্লোগান থাকলেও, এমনকী কখনও কখনও তা মারমুখী হয়ে উঠলেও, নেতৃত্বকারী দল হিসাবে সিপিএমের আসল লক্ষ্য ছিল আন্দোলনে মানুষের আত্মত্যাগকে পুঁজি করে নির্বাচনে আসন বাড়ানো এবং শেষপর্যন্ত সরকারি গদি দখল করা। নিচুতলার কর্মীরা সেদিন নেতাদের মুখে আন্দোলনের কথা, বিপ্লবের কথা, শ্রেণী সংগ্রামের কথা শুনে এই দলটিকেই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি বলেই ভেবেছিল। '৬৪ সালে ডাঙ্গে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসকামীতার অভিযোগ এনে সিপিআই ভেঙে সিপিএম তৈরি হয়েছিল। তারা ঘোষণা করেছিল, সিপিআই নয়, সিপিআই(এম)ই বিপ্লব করবে। নেতাদের এই বিপ্লবী বুকনীতে বিশ্বাস রেখেই নিচুতলার সৎ, আদর্শবান, সংগ্রামী বামপন্থী সংগঠক কর্মীরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছে। নেতাদের বক্তব্যের সত্যতা, দলের নীতি, লাইন কোন কিছুই যাচাই করার তাঁরা প্রয়োজনই অনুভব করেনি। সিপিআই, সিপিএম যে আদৌ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে মার্কসবাদী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়েই উঠতে পারেনি — এ বিচারও তারা করতে পারে নি। প্রায় তিন দশক সরকারে থাকার সুবাদে আজ যখন এই দলগুলিই অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতোই যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, বেপরোয়া কর বসাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের পক্ষে সওয়াল করছে, একদিন দলের যে নেতারা দেশিয় একচেটে পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়েছেন, আজ তাঁরাই যখন উন্নয়নের ঢাক পিটিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজির দাক্ষিণ্য করজোড়ে প্রার্থনা করছেন, মালিকের শত শোষণ ও আক্রমণ সত্ত্বেও, পরিবর্তিত পরিস্থিতির দোহাই পেড়ে — 'জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন চলবে না' বলে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং শ্রমিক আন্দোলন গলা টিপে মারছেন, তখন স্বভাবতই দলের পুরনো সংগ্রামী মানুষজনের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কঠিন হচ্ছে, এতদিনের চেতনা ও বিবেক প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে। পার্টির এই পরিবর্তিত রূপের সাথে যারা মানিয়ে নিচ্ছে, বা এরই ভিত্তিতে যারা পার্টিতে আসছে তারাই এখন দলের সম্পদ, তারাই এখন করে-কম্মে খাচ্ছে। আর, যাঁরা মানতে পারছে না, পার্টির চোখে তাঁরা আজ ব্যাকডেটেড, অচল। আবার এঁদের সততা, নিষ্ঠা ও সংগ্রামের সাথে জনগণ ও নিচুতলার কর্মীরা যথেষ্ট পরিচিত বলেই নেতৃত্বের পক্ষে এঁদের বিরুদ্ধে যা হোক কিছু অপবাদ দেওয়া মুসকিল হচ্ছে, প্রকাশ্যে নিন্দা করা যাচ্ছে না। তাই পার্টি নেতৃত্ব এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিচ্ছে, যাতে এঁদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায়, তাঁরা নিজেরাই দল ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। হারাধনবাবুর ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসই ঘটেছে। অনেকেরই স্মরণে আছে, এই জেলারই অপর একজন নেতা, পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত বিনয় চৌধুরী একসময় রাজ্য সরকারকে এই বলে চিহ্নিত করেছিলেন যে, এই সরকার 'অফ দ্য কন্ট্রাক্টর, বাই দ্য কন্ট্রাক্টর, ফর দ্য কন্ট্রাক্টর' অর্থাৎ জনগণের নয়, ঠিকাদারদের সরকার। সকলেই জানেন, একথা বলার অপরাধে কীভাবে বিনয়বাবুকে নিঃশব্দে সংগঠন থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এমতাবস্থায়, যাঁরা আজও শাসকদলের সাথে রয়েছেন, শোষিত মানুষের স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলন-গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার কথা ভাবছেন, আবার নেতৃত্বের দ্বিচারিতায়, আপসকামীতায় ব্যথিত হচ্ছেন, নেতৃত্বের মুখে পরিবর্তিত পরিস্থিতির তত্ত্ব শুনে বিভ্রান্ত হচ্ছেন — তাঁদের কাছে হারাধন রায়ের ট্র্যাজেডি এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। একথা বোধহয় আজ তাদের বোঝা দরকার যে, সৎ-সংগ্রামী মানুষের স্থান আজ আর শাসক বামপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে নেই। সততা-সংগ্রাম আজ শাসক পার্টিগুলির উচ্চাকাঙ্খা পূরণে বাধা। যত দিন যাচ্ছে ততই এগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং হারাধনবাবুদের মত সংগ্রামী মানুষরা দল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

মজদুর বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে

বরাকরে শ্রমিক সম্মেলন

বর্ধমান জেলার সালামপুর, বরাকর, নিরসা অঞ্চলের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রমিক বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে দ্বিতীয় শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৬ সেপ্টেম্বর বরাকরের লখিয়াবাদে। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ, ভারত কোকিং কোল লিঃ, ডিভিসি-মাইথন, ইমপেক্স কেরোটেক লিঃ, বালাজী গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ সহ এলাকার বিভিন্ন কলকারখানায়, কয়লাখনি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত দেড়লক্ষাধিক শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিসিসিএল বেগুনিয়া কোলিয়ারির শ্রমিক নেতা কমরেড সাধু কোড়া। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সহসভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও নয়া উদারনীতি রূপায়ণ করার ফলে এই অঞ্চলের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ আজ এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ইতিমধ্যেই ইস্কো-কুলটি ও সেন র‍্যালে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ও ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিঃ ও ভারত কোকিং কোল লিমিটেডে আউট সোর্সিং-এর নামে কয়লাশিল্পে বেসরকারীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ইসিএল, বিসিসিএল, ইস্কো, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, হিন্দুস্তান কেবলস্ সমেত সমস্ত সরকারি শিল্পেই ভিআরএসের মাধ্যমে ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে।

অপরদিকে, এই উদার আর্থিক নীতির জমানায় এসব অঞ্চলের প্রাইভেট কলকারখানার শ্রমিকরা সীমাহীন মালিকী শোষণের শিকার। যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই এখানকার নিত্যদিনের ঘটনা। এগুলিতে দৈনিক মজুরি ৩০ থেকে ৪৫ টাকা, যা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির থেকেও অনেক কম। আইন মোতাবেক পিএফ, ইএসআই বা মেডিক্যালের কোন ব্যবস্থাই নাই। এক কথায়, মালিকরা দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলি মানেই না।

এমতাবস্থায় যখন সরকারি ও মালিকী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে সিপিএম ও কংগ্রেস মালিকদের পক্ষ নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র আদর্শে অনুপ্রাণিত মজদুর বাঁচাও কমিটির নেতৃত্বে কলকারখানায় খাদানে শ্রমিকরা সংগঠিত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতাতেই অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় শ্রমিক সম্মেলন। সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার জন্য সিপিএম ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খুদিকা, কালিপাথর সহ কয়লা খনি অঞ্চলের বিভিন্ন মহল্লা ধাওড়াতে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সম্মেলন সফল হয়েছে। উদ্বোধক কমরেড এ এল গুপ্তা সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আগামী দিনে সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান।

সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন মজদুর বাঁচাও কমিটির সভাপতি কমরেড অমর চৌধুরী, রিপোর্টের উপর আলোচনায় অংশ নেন কমরেডস্ অরুণ গরাই, রতন হাঁসদা, হীরু তন্তুবায়, শঙ্কর সিং, মুকুল সিং, রাজেন্দর পাশী সহ ২৬ জন প্রতিনিধি।

প্রধান অতিথির ভাষণে কমরেড গোপাল কুণ্ডু বলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া শ্রমিক জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। তাই শ্রমিকদের একদিকে মালিকী ও সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন লড়াই করতে হবে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির সঠিক রাজনীতি কোন্‌টা, সেটাও গভীরভাবে বুঝতে হবে এবং ভোটসর্বস্ব রাজনীতির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

সম্মেলনে কমরেড অমর চৌধুরীকে সভাপতি ও পরেশ কোড়াকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ২৫ জনের কার্যকরী সমিতি নির্বাচন করা হয়। কয়লা শিল্পে বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে এবং কয়লা শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতনচুক্তি, কয়লা আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, সমস্ত শিল্প-শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, সারা বছর কাজ পাওয়ার আইনি স্বীকৃতি, অসংগঠিত শ্রমিকদের পি এফ, পেনশন ও চিকিৎসা ভাতার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্মেলনে।

যোজনা কমিশনে বিদেশি উপদেষ্টা

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ভজনা করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না

১০ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজকর্ম কতটা হয়েছে কিংবা কী কী করা দরকার তা খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন এবার একাধিক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেছিল।

ইতিপূর্বে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী পর্যালোচনার সময় এই ধরনের কমিটি গঠন করা হয়নি। এবার শুধু কমিটি গঠন নয়, কমিটিগুলিতে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) এবং ম্যাকিন্‌সের মতো সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করে। এর আগে নানা বিষয়ে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, মতামত নিলেও বিদেশি ঋণদানকারী এবং পরামর্শদাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের মতো দেশের নীতি নির্ধারক একটি সংস্থার সদস্য হিসাবে নিয়োগের ঘটনা এই প্রথম।

সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করে। সিপিএমের ঘনিষ্ঠ যেসব অর্থনীতিবিদদের ঐ কমিটির সদস্য করা হয়েছিল, তাঁরা চাপ দেওয়ার জন্য একযোগে পদত্যাগ করার হুমকি দেন। এরপরই বিদেশি সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা কমিটি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এঁদের পদত্যাগের পরে পরেই যোজনা কমিশন সমস্ত উপদেষ্টা কমিটিগুলিই ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পূর্বেকার মতই বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত স্তরে পরামর্শ নেওয়া হবে। দেশের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যেমন নেওয়া হবে ; বিশ্বব্যাঙ্ক, এডিবি, ম্যাকিন্‌সের কাছ থেকেও পরামর্শ নেওয়া হবে। কোন পরামর্শদাতা কমিটি করা হবে না, ফলে তার সদস্য নেওয়ারও প্রশ্ন থাকছে না।

এ ঘটনার যে ব্যাখ্যাই সরকার দিক না কেন, এ কথা স্পষ্ট যে বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়োগ করাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। তা নাহলে পরিস্থিতির চাপে তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় সমস্ত কমিটিগুলিই ভেঙে দেওয়া হল কেন? এদেশে অর্থনীতি এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভাব আছে এমন নয়। কিংবা এইসব পদত্যাগী মানুষগুলি বিরাট বিরাট অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ বলে সদস্যপদ পেয়েছিলেন তা নয়। যোজনা কমিশনে এঁরা যোগ দিয়েছিলেন ব্যক্তি হিসাবে নয়, বিশ্বব্যাঙ্ক, এডিবি কিংবা ম্যাকিন্‌সের মতো বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে। এই সংস্থাগুলির কাজ কী? বিশ্বব্যাঙ্ক ও এডিবি ঋণদানকারী সংস্থা এবং ম্যাকিন্‌সে হচ্ছে আর্থিক নীতি বিষয়ে একটি পরামর্শদাতা সংস্থা। এদের কোনটিই দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়; এরা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি-মালিকদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের যে কার্যক্রম চলছে, দেশে দেশে সে কাজের অগ্রগতি কতদূর তা দেখভাল করাই এদের মূল কাজ। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এডিবি বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের যোগান দিয়ে দরিদ্র দেশগুলিকে একদিকে ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে, অন্যদিকে চাপিয়ে দেওয়া নানা শর্ত পালনে বাধ্য করে এইসব দেশের বাজার সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। পরামর্শদাতা সংস্থা ম্যাকিন্‌সের কাজ হল দেশের বিভিন্ন সরকারগুলিকে এমনভাবে নীতিনির্ধারণে পরামর্শ দেওয়া যাতে ঐসব বাজারে সহজেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি অবাধে ঢুকতে পারে — যেটাকেই অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হচ্ছে নয়া উদারনীতি।

এহেন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা পরিকল্পনার অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় পরামর্শ দেওয়ার নামে বেসরকারীকরণের কার্যক্রম সহ সকল ক্ষেত্রে নয়া উদারনীতির ফর্মুলা ও শর্তগুলি পালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়েই যে খোঁজখবর করবে এবং সেরকম ব্যবস্থা নিতেই যে সরকারকে পরামর্শ দেবে — এ কথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। প্রশ্ন হল, এদের পরামর্শ পাওয়ার জন্য কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের এত ব্যগ্রতার কারণ কী?

আসলে বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের সঙ্গে যেন তেন প্রকারেণ ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই প্রবল আগ্রহী। এই ঘনিষ্ঠতার দ্বারা দেশীয় বাজারের কিছু অংশ তাদের ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববাজারে ভাগ পেতে চায় ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। এনিয়ে দরকষাকষি বহু বছর ধরেই চলছে। বাজার সংকটে জর্জরিত ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিদের এই স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্যই কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার আর্থিক নীতিনির্ধারণে স্থান দেবার চেষ্টা করেছিল সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের। যোজনা কমিশনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের সংযুক্ত করার এই ঘটনায় কংগ্রেসের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা চরিত্রটি আবার যেমন উদ্‌ঘাটিত হল, তেমনি আবারও প্রমাণ হয়ে গেল যে, নয়া শিল্প ও আর্থিক নীতি ভারতীয় শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীরই নীতি হওয়ায় এই প্রশ্নে দেশের দুই প্রধান পুঁজিবাদী দল বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও মৌলিক তফাৎ নেই।

একথা সত্য যে, যোজনা কমিশনে বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধি নিয়োগের বিরুদ্ধতা করেছে সি পি এম ও তার সহযোগী দলগুলি। তাদের বক্তব্য ছিল, এইসব বিদেশি সংস্থা মূলত আমেরিকার কথায় চলে। ফলে এদের প্রতিনিধিদের কমিটিতে রাখা হলে নীতিনির্ধারণে কার্যত আমেরিকার হস্তক্ষেপ ঘটবে, যেটা ভারতের সার্বভৌমত্বকেই ক্ষুণ্ণ করবে।

এই বক্তব্য থেকে মনে হতেই পারে যে, সিপিএম নেতৃত্ব যেন ভারতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রবেশের প্রবল বিরোধী, সেজন্য এইসব সংস্থাগুলির কোনরকম সংসর্গই তারা পছন্দ করে না। কিন্তু সত্যই কী তাই?

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করার পরমুহূর্ত থেকেই সিপিএম বিশ্বব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ঋণদানকারী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। '৭৮ সালেই বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ঋণ নিয়েছে। এরপর চলেছে বিশ্বব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে যাবতীয় শর্ত মেনে একের পর এক প্রকল্পে ঋণগ্রহণের পালা। কলকাতা শহর উন্নয়ন প্রকল্পে এসেছে ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ১৯৮৩-তে বিশ্বব্যাঙ্ক আবার ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। সেই '৮২ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের এক কর্তা সিপিএম ফ্রন্ট সরকারকে 'সার্টিফিকেট' দিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বব্যাঙ্ক ৯৬টি দেশে ১৩৯টি শহরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে (পড়ুন ঋণদান প্রকল্পে) যুক্ত, কিন্তু কলকাতার মতো এমনভাবে আর কোথাও জড়িয়ে পড়েনি। হালে ২০০২-'০৩ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে এ রাজ্য ঋণ নিয়েছে ১৬৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। অন্যান্য সূত্র থেকে এসেছে ১৩৯ কোটি টাকা যার বেশিটাই বিদেশি সাহায্য। শুধু বিশ্বব্যাঙ্ক নয়, এ রাজ্যে এডিবি-র ২০ কোটি টাকা খাটছে এই মুহূর্তে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে জার্মানি, হল্যান্ড, ব্রিটেনের মতো বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপুল অর্থ এ রাজ্যে খাটানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ম্যাকিন্‌সেকে দিয়ে নয়া কৃষিনীতি তৈরি করিয়েছে, দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে এ রাজ্যে তা রূপায়ণও করছে, যার ধাক্কা ইতিমধ্যেই চাষীজীবনে পড়তে শুরু করেছে। (তথ্যসূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ৩০-৯-০৪)

বিদেশি ঋণের প্রতিটি পাই-পয়সার জন্য শুধু সুদ গুণে দিতে হচ্ছে তাই নয়, প্রতিটি ঋণ-অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ঋণদাতা সংস্থাগুলির চাপানো বহুবিধ বিপজ্জনক শর্ত। তাদের সেই শর্ত মেনেই নির্বিচারে চলছে খালপাড়ে, রেললাইনের ধার থেকে জনবসতি উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদের পালা। এদেরই কথা মতো তৈরি করা হচ্ছে শিক্ষানীতি-শিল্পনীতি। এই ঋণদাতা সংস্থাগুলির কড়া নির্দেশ শিরোধার্য করে আজ সরকার জনপরিষেবার নানা খাতে ভর্তুকি ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছে। শিক্ষা পেতে হলে, কিংবা অসুখে চিকিৎসা পেতে হলে কড়ায়-গণ্ডায় উচ্চ দাম গুণে দিতে হচ্ছে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। দাম বাড়ছে সার, কীটনাশকসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণের। দলে দলে কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এদের শর্তেই পানীয় জলে কর বসছে। রাস্তা, ব্রিজ ব্যবহার করলে সাধারণ মানুষকে 'টোলট্যাক্স' দিতে হচ্ছে। ই আর এস, ভি আর এসের কৌশল চালু করে কলকারখানা অফিস কাছারিতে কীভাবে কর্মীসংখ্যা কমানো যায় সেই পরামর্শও এই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজির তল্পিবাহক সংস্থাগুলি রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে এবং রাজ্য সরকারও বিনা প্রশ্নে তা মেনে নিচ্ছে। এ রাজ্যের সরকারি সংস্থা ওয়েবেল বন্ধ করে দিতে শ্রমিকদের আগাম অবসরের জন্য টাকা দিচ্ছে ব্রিটিশ সংস্থা ডি এফ আই ডি। রাজ্য বাজেটের ব্যাপারেও আলোচনা করা হচ্ছে এই সংস্থার সঙ্গে।

এই অবস্থায় সিপিএম নেতাদের মুখে 'যোজনা কমিশনে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের রাখা চলবে না' বলে হুংকার কি লোকঠকানো নয়? এটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে 'বিশ্বব্যাঙ্কের লোক' বলে আসর গরম করে দেবার পরেই আবার সুর নরম করে সিপিএম নেতারা জানান যে, বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের শুধুমাত্র কমিটিতে রাখার ব্যাপারেই তাঁদের আপত্তি, পরামর্শ, মতামত নেওয়ার ব্যাপারে নয়। এ কেমন বিরোধিতা? ওদের পরামর্শ মেনে চলব ; ওদের দেওয়া ঋণের টাকা নেব, ঋণের শর্ত মেনে চলব। সবই চলবে, শুধু ওদের কমিটিতে রাখা চলবে না — এ কোন ধরনের নৈতিকতা ? আসলে কংগ্রেসের সাথে নকল বিরোধ দেখাবার ও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা ভূমিকা আড়াল করার জন্যই তাদের এই বিরোধিতা দেখাতে হচ্ছে। নাহলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পরই সিপিএম নেতারা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন কোন্ যুক্তিতে?

এইভাবে দ্বিচারিতার আশ্রয় নিয়ে সহজে বাজিমাৎ করার চেষ্টায় সিপিএম নেতৃত্ব শুধু দেশের সাধারণ মানুষকে ও নিজেদের দলের সৎ কর্মীদের প্রতারণা করছে তাই নয়, এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষকে একজোট করে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজেও বাধা সৃষ্টি করছে। এই সমস্ত দলগুলির সৎ কর্মী-সমর্থক যাঁরা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে চান, তাঁদের বুঝতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ভজনা করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না, বরং ঐ লড়াইয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করা হয়।

ওয়েবেলে দাস-শ্রমিক

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি সংস্থা ওয়েবেল-এর কর্মচ্যুত কিছু শ্রমিককে ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেডে যে শর্তে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হচ্ছে, তা গণতান্ত্রিক অধিকার ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক।

কালা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ বললে এই শ্রমিকরা কাজের নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও অতিরিক্ত সময় এবং ছুটির দিনেও কাজ করতে বাধ্য থাকবে। শ্রমিকদের রাজনীতি করা, ধর্মঘট বা অন্য কোনও প্রতিবাদ আন্দোলন করার অধিকার থাকবেনা। এইভাবে শ্রমিকদের 'দাস শ্রমিক'-এ পরিণত করার ফ্যাসিস্ট পদক্ষেপ ইতিপূর্বে বি জে পি বা কংগ্রেস পরিচালিত কোনও সরকারও করতে সাহস করেনি, যেটা সি পি এম বামপন্থার নামে করছে। এটা পুনরায় প্রমাণ করে যে, দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে সিপিএম শ্রমিক আন্দোলন দমনকারী ফ্যাসিস্ট ভূমিকা নিচ্ছে এবং অন্যান্য রাজ্যের সরকার ও বেসরকারি মালিকদের পথ দেখাচ্ছে। আমরা এই কালা চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করছি ও প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।"

মেদিনীপুরে মিড-ডে মিলের চাল চুরির প্রতিবাদ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার ২৪টি ও হলদিয়া পৌরসভা এলাকার ১২টি মাধ্যমিক স্কুলের পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘ ৬ বছর যাবৎ মিড-ডে মিলের চাল পাচ্ছে না। অথচ চাল পরিবহনের খরচ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ — যদিও সরকারই এই খরচের টাকা দিয়ে থাকে। ঐ ব্লকের শুভানিচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মাথা পিছু ৭ টাকা করে নিয়েছেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কোন কোন স্কুলে মাথাপিছু ৩ টাকা নেওয়া হয়েছে। হলদিয়া পৌর এলাকার বিরিঞ্চিবেড়িয়া, তেতুঁলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের চাল না দিয়ে স্কুল উন্নয়নের নামে, কোথাও স্কুলে উৎসবের নামে ঐ চাল বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের জন্য দরিদ্র মানুষদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের (এস জি আর ওয়াই) হাজার হাজার কুইন্ট্যাল চাল ডিলাররা খোলা বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে সরকারি দলের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

এর প্রতিবাদে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে

এ আই ডি এস ও'র ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্মেলন

দু'বছর আগেও ডি এস ও'র কাজ সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র ২টি জেলায়। আর ৫ অক্টোবর ১৩টি জেলা থেকে ছাত্ররা এসেছিল ডি এস ও'র ১ম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিতে। রাঁচি স্টেশন থেকে ঠিক ১২টায় শুরু হয় ২ হাজার ছাত্রছাত্রীর বর্ণাঢ্য, সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল দৃপ্ত মিছিল। পুরোভাগে রাজ্য নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে বেলা ১টায় মিছিল এসে পৌঁছায় রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য সমাবেশের স্থলে। ডি এস ও'র পতাকা ও ব্যানারে সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে ঠিক দুটোয় সভা শুরু হয় রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড মোহন সিং-এর ভাষণের মধ্য দিয়ে। এরপর বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক প্রবীণ জননেতা কমরেড হেম চক্রবর্তী। কমরেড চক্রবর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে জোরদার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এরপর বক্তব্য রাখেন প্রকাশ্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ রমেশ শরণ। ডঃ শরণ তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে ডি এস ও'র বক্তব্য ও আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা সংগঠনের সহসভাপতি কমরেড দীপক কুমার এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এ আই ডি এস ও'র ৫০বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানকে সফল করতে আহ্বান জানান। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা কমরেড মদন চ্যাটার্জী।

৬ অক্টোবর, রাঁচি এস ডি সি হলে সকাল ১০-৩০টায় ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়ের উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। মূল প্রস্তাব ও সাংগঠনিক প্রস্তাব সহ আরও তিনটি প্রস্তাব সম্মেলনে আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। কমরেড ধর তাঁর ভাষণে ছাত্র সমাজকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে কমরেড মদন চ্যাটার্জীকে সভাপতি ও কমরেড মোহন সিংকে সম্পাদক করে ২০ জনের রাজ্য কমিটি ও ২৫ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

'লড়াই চলবে' — প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে জানিয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকরা

সংগ্রামী শ্রমিকদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাছে হার মানল প্রবল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা। একটানা বর্ষণে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত, তখন কলকাতার রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে আসা চা-শ্রমিকদের সোচ্চার দাবিতে, প্রতিবাদে, শপথে।

৫ অক্টোবর ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে ডুয়ার্স-তরাই এর চা-শ্রমিকরা এসেছিল মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হতে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে চলা চল্লিশটি বাগানের সহস্রাধিক শ্রমিকের মিছিল দেখে নড়ে চড়ে ওঠেন মাথায় হাত দিয়ে বসা হকার, রিক্সাচালক, ভ্যানওয়ালারা। মিছিলের উষ্ণতা সঞ্চারিত হয় তাদের মধ্যে।

রানি রাসমণি রোডে মিছিলের গতিরোধ করে বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। সেখানেই শুরু হয় বিক্ষোভ প্রদর্শন। বন্ধ চা-বাগানের লীজ বাতিল ও সরকারি অধিগ্রহণ; সমস্ত চা-শ্রমিকের বেতন, রেশন, পানীয় জল, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধা; পি এফ, গ্র্যাচুইটি, এল আই সি'র টাকা আত্মসাৎকারী মালিকদের কঠোর শাস্তি; অনাহারে মৃতদের পরিবারবর্গের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ; নতুন চা-বাগানগুলিকে প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট, বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলোকে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট এবং উভয়কেই চা-শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য সমস্ত আইন ও চুক্তির আওতায় আনা এবং অবিলম্বে নতুন বেতন চুক্তি সম্পন্ন করা — এই ৬ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে ৯২,৪১৬ জন চা-শ্রমিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এনেছিলেন বিক্ষোভে সামিল শ্রমিকরা। তাদের পক্ষ থেকে নর্থবেঙ্গল টী প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক, শ্রমিক নেতা বিমল জানা, কাজী লামা, এবং গোপাল খেস মহাকরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যুগ্মসচিবের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, অবিলম্বে সরকার দাবিপূরণে সদর্থক পদক্ষেপ না নিলে শুরু হবে বৃহত্তর আন্দোলন।

সমবেত শ্রমিকরাও দৃপ্তকণ্ঠে সেই ঘোষণাই করলেন। তাঁরা বললেন, বন্ধ চা বাগান খোলা ও অন্যান্য দাবিতে দু'বছর যাবৎ চলছে তাঁদের লড়াই। বহুবার তাঁরা সামিল হয়েছেন মিছিল, মিটিং, ধর্নায়। শিলিগুড়িতে ২৪ ঘণ্টা, জলপাইগুড়িতে ৪০ ঘণ্টার অনশন ধর্মঘট হয়েছে বছর দেড়েক আগে। গত ১০ ডিসেম্বরে শিলিগুড়িতে 'কানুন তোড়ো, জেল ভরো' আওয়াজ তুলে পুলিশের লাঠির মোকাবিলা করেছে চা-শ্রমিকরা। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত ডুয়ার্স তরাই-এর শ্রমিকরা সাইকেল র‍্যালিতে সামিল হয়ে বিক্ষোভ দেখায় ডিভিশনাল

কমিশনার-এর দপ্তরে। ২৪ মার্চ সরকারি দপ্তর অবরোধ করা হয়। পুলিশের লাঠিতে রক্ত ঝরে আলিপুরদুয়ার কোর্ট চত্বরে। এই আন্দোলনের চাপেই সরকার সামান্য হলেও কিছু রিলিফ-এর ব্যবস্থা করে, নীতিগতভাবে বন্ধ বাগানের লীজ বাতিলের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এরপর শুরু হয় বাগানে বাগানে ৬ দফা দাবির পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, ৩১ আগস্ট

আটের পাতায় দেখুন

বর্ধমান

ধর্ষণের বিরুদ্ধে মহিলাদের প্রতিবাদ

গত ৩০ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার গোপালপুর গ্রামে একটি বীভৎস ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ঐ গ্রামেরই গণেশ হালদার নামে এক যুবক বিবাদের জের মেটাতে বাবু বালা নামক এক দীনমজুর যুবকের বাড়িতে মাঝরাতে লাঠি-রড প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ চালায়। বাবু আগেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় বাবুর ৫৬ বছর বয়স্কা বিধবা মাকে গণেশ সামনের মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এলাকার লোক অজ্ঞান অবস্থায় মহিলাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে এবং পরদিন সকালে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এলাকার মানুষই অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মহিলা এখন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, মৃত্যুর সাথে লড়ছেন।

খবরটি জানামাত্রই সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন-এর জেলা সভানেত্রী কমরেড শ্যামলী মুখার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে মহিলার সাথে দেখা করে এবং সুপারের কাছে অভিযোগ জানায়। এরপর ৩ অক্টোবর সকালে দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজারের প্রান্তিকা মোড় এবং ৪ অক্টোবর দুর্গাপুর কোর্টের সামনে পথসভার আয়োজন করা হয় এবং এস ডি ওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড শ্যামলী ব্যানার্জী, দীপালি ব্যানার্জী ও কল্পনা ব্যানার্জী। তাঁরা বলেন, মানুষের বিবেক, মনুষ্যত্বকে কেড়ে নেওয়ার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মদের ওপর ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে, অশ্লীল পত্রপত্রিকা, নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন, ভিডিও হলগুলিতে ব্লু ফিল্ম বেড়েই চলেছে আর তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে নারীকে, ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অবিলম্বে এর প্রতিকার না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করেন।

টিপির বাঁধ কাটলেন হাজার হাজার মানুষ

বনগাঁ, বসিরহাট মহকুমার লক্ষ লক্ষ মানুষ বার বার দাবি করা সত্ত্বেও সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার টিপির বাঁধ কেটে যমুনা-ইছামতীকে সরাসরি সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করেনি। ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যার পর রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন ৪ দিনের মধ্যে টিপির বাঁধ কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ৪ বছর হয়ে গেল ১ কোদাল মাটিও টিপির বাঁধ থেকে কাটা হয়নি। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বার বার ডিএম, এসডিও, বিডিও'র কাছে দাবি জানানো সত্ত্বেও রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

কিন্তু ৭ অক্টোবর গাইঘাটা ও স্বরূপনগরের হাজার হাজার মানুষ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া থেকে সকাল ৯টায় অসংখ্য মানুষ কোদাল, শাবল নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে যাত্রা শুরু করে টিপির উদ্দেশ্যে প্রশাসনের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে। যাত্রাপথে যাদবপুর, শাঁকদা, সগুনা, কপিলেশ্বরপুর, দিয়ারার শত শত মানুষ সামিল হয় এই অভিযানে। যাত্রাপথের দু'পাশে হাজার হাজার মা-বোন সহ সর্বস্তরের মানুষের উষ্ণ সমর্থন নিয়ে ঝড়জলকে উপেক্ষা করে প্রায় ১০ কিমি পথ হেঁটে দুপুর ১টায় হাজার হাজার মানুষ পৌঁছায় টিপির চরে। শুরু হয় যমুনা-ইছামতীর সরাসরি সংযোগের জন্য বাঁধ কেটে দেওয়ার কাজ। কাজ চলে প্রায় বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দু'পাশের বাঁধ কেটে দেওয়ার পর যমুনা থেকে ইছামতীতে প্রবল বেগে জল নামতে শুরু করে। এই মহতী অভিযানে সামিল হয়েছিলেন এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস সহ অন্যান্য কর্মীরা।

এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল সংগঠিত সংগ্রামী জনগণই পারে তাদের দাবি আদায় করতে। এই শিক্ষাকে স্মরণে রেখে বন্যা প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে বাধ্য করার মতো আন্দোলন গড়ে তুলতে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বন্যা প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই।

পরপর শিশুমৃত্যুও মন্ত্রীদের এখন বিচলিত করে না

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার ভোররাতে বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং তার ফলে চারটি শিশুমৃত্যুর ঘটনা ও সেই সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও মন্ত্রীবর্গের প্রতিক্রিয়া নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সেই চিরপুরাতন সত্যটি — আমাদের দেশে গরিব সাধারণ মানুষের জীবন প্রশাসন ও নেতৃবর্গের কাছে কতটা মূল্যহীন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, এমনকি প্রাণহানির মত ঘটনাও তাদের মধ্যে তোলে না সামান্যতম অনুভূতির অনুরণন। তাই ঘটনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে বসে তাঁরা নির্বিকারচিত্তে ব্যক্ত করতে পারেন তাঁদের আশ্চর্য নিরাসক্ত সব প্রতিক্রিয়া। আর এই ঘটনার পিছনে দোষটা কার, তাই নিয়ে শুরু হয় পারস্পরিক দোষারোপ ও নির্লজ্জ চাপান-উতোর।

কি তাঁদের সেই প্রতিক্রিয়া? না, তাঁদের মতে চারটি শিশুর মৃত্যুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, এর সাথে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কোনও সম্পর্ক নেই। অবশ্য এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে স্বাস্থ্যদপ্তরের এমনকি কোনও তদন্তেরও প্রয়োজন হয় নি। সোমবার রাতে স্বাস্থ্যসচিব কল্যাণ বাগচি ও স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা ডাঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান এবং তারই ভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র সহ স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তারা জানিয়ে দেন যে, চারটি শিশুর অবস্থাই আশঙ্কাজনক ছিল ও তাদের মৃত্যু স্বাভাবিক। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক? নৈব নৈব চ।

সাথে সাথে শুরু হয়ে গেছে বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণ নিয়েও চাপান-উতোর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তো বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি'র উপর দোষ চাপিয়ে খালাস। আর সিইএসসি জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম কোম্পানি নিজেদের বিদ্যুতের খুঁটি পুঁততে গিয়ে লাইন ট্রিপ করে ফেলায় এই বিপত্তি। অতএব তারা ঝাড়া হাত-পা। আর ট্রাম কোম্পানির প্রতিক্রিয়া আরও অভাবনীয়। তাঁদের কর্তাব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, এরকম কোনও ঘটনার কথা তাঁদের জানাই নেই। জানলে ব্যবস্থা নেবেন।

অথচ বাস্তব ঘটনা কি? টানা দেড় ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকার কারণে হাসপাতালে যে অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা সুস্থ বয়স্ক লোকেদেরই অসুস্থ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সেখানে অসুস্থ সদ্যোজাত শিশুদের যে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে অন্তত দু'টি কারণে শিশুমৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল। প্রথমত, অন্ধকারে ভয় পেয়ে শিশুরা কাঁদতে শুরু করলে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের

আটের পাতায় দেখুন

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

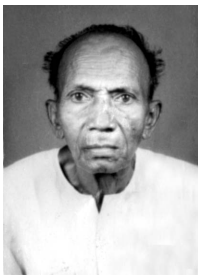

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সিংভূম জেলার পোটকা ব্লকের প্রবীণ পার্টি সংগঠক কমরেড রোহিণী পাত্র গত ২০ আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ১০ সেপ্টেম্বর পোটকা ব্লকের মানপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটি ও সিংভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিমল দাস প্রয়াত কমরেডের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এরপরে এস ইউ সি আই ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড ধীরেন ভকত, এ আই এম এস এস-এর পক্ষ থেকে কমরেড খোকী মাহাতো, এ আই কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকে কমরেড শৈলেন মুন্ডা, সিংভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড সুমিত রায়, এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে কমরেড উমাকান্ত পাত্র, কমরেড কমলিনী সরদার, কমরেড উপাসিনী সরদার, ডাঃ রেবিকা জ্যোতিষী, অজিত চ্যাটার্জী, নাগেশ্বর ধল, খাসীরাম পাত্র, শিশির পাত্র, নুনু রজক, করণ হেমব্রম প্রয়াত কমরেডের প্রতি পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

কমরেড বিমল দাস বলেন, প্রয়াত কমরেড রোহিণী পাত্র মোসাবনী খনিতে কার্যরত অবস্থায় এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সহযোদ্ধা কমরেড হীরেন সরকারের সান্নিধ্যে আসেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন এবং সেই এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি চাকরি ছেড়ে দেন এবং নিজ গ্রাম মানপুরে এসে মানপুর, কালিকাপুর অঞ্চলে দলের কাজকর্ম শুরু করেন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। পার্টি কমরেডদের প্রতি ছিল তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। তিনি অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন। অন্যায় দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, একা হলেও প্রতিবাদ করতেন। শরীর অসুস্থ থাকার সময়েও তিনি পার্টির কাজকর্মের খোঁজখবর নিতেন, দলের পত্রিকা এবং শিবদাস ঘোষের বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। তাঁর জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। মানুষের সাথে তিনি দলের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। নতুন কমরেডদের আরো এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ তৈরি করে দিতেন। প্রয়াত কমরেড রোহিণী পাত্রের জীবনসংগ্রাম ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে পার্টি সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে — এটাই হবে প্রয়াত কমরেডদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড ধীরেন ভকত, খোকী মাহাতো, নীরেন কুমার ভকত, নাগেশ্বর ধল, বীরেন্দ্র দেও। সভাপতিত্ব করেন আপতী মুন্ডা।

কমরেড রোহিণী পাত্র লাল সেলাম

দিল্লিতে বিশাল ছাত্রমিছিল

একের পাতার পর

দিল্লির এই সংসদ অভিযান। গত দু'মাস ধরে রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন ফি, ডোনেশন ও ভর্তি সমস্যা নিয়ে স্কুল স্তর থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে রাজ্য স্তরে ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লির সংসদ অভিযানের প্রস্তুতিতে এক মাস ধরে দিল্লি ও সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে ডি এস ও'র স্বেচ্ছাসেবক ও সংগঠকরা নিরলস পরিশ্রম করে স্কুল-কলেজে ঘুরে ঘুরে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগায় এবং আন্দোলনমুখী মানসিকতা সৃষ্টি করে।

বরোদার এম এফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্ররা, পাঞ্জাবের পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, যারা সালসা-রোপার-মোহালি-চন্ডীগড়ে দু'বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেছে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে, তারা ও তাদের সাথে বিভিন্ন কলেজ থেকে শত শত ছাত্র এসেছে বিক্ষোভ সমাবেশে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুর, জৌনপুর, মোরাদাবাদ সহ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল-কলেজ থেকে এসেছে শত শত ছাত্রছাত্রী লড়াইয়ের দৃঢ় সংকল্প বুকে নিয়ে। মধ্যপ্রদেশের সাগর, ভোপাল, জবলপুর, গুণা, গোয়ালিয়র থেকেও এসেছে দলে দলে ছাত্রছাত্রী; এসেছে নাগপুর, দুর্গ, ভিলাই ও দণ্ডকারণ্য থেকেও।

১৯৮৬ সালে কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার, তখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষানীতি'র যে রূপরেখা তৈরি হয়েছিল, তাতেই শিক্ষায় সরকারের আর্থিক দায়দায়িত্ব অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসই শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের সিংহদরজা খুলে দিয়েছিল, মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার নামে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা বিষয় সিলেবাসে ঢুকিয়েছিল। কংগ্রেসের দেখানো সেই পথেই বিজেপি সরকার হেঁটেছে আরও দ্রুতগতিতে। সেদিন কংগ্রেস প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এ আই ডি এস ও। আজ সেই কংগ্রেসেরই নেতৃত্বে সিপিএমের সমর্থনে কেন্দ্রে নতুন ইউপিএ সরকার বসেছে।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সাথে আলোচনা করছেন এ আই ডি এস ও'র নেতৃবৃন্দ

তাই, গত ১ মাস ধরে প্রচারের সময় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জে এন ইউ বা জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বা হরিয়ানার রোহতক বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এ আই ডি এস ও'র কর্মীরা ছাত্রদের বোঝাতে চেয়েছে, তথাকথিত বামপন্থী ছাত্রসংগঠন এস এফ আই বা এ আই এস এফ ছাত্রদের বিভ্রান্ত করার যে চেষ্টাই করুক না কেন, দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবাদাস কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের কাছ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতিমুখী পদক্ষেপ আশা করা যায় না। যদি ছাত্রস্বার্থে, শিক্ষাস্বার্থে ন্যায্য দাবি আদায় করতে হয়, তবে তা একমাত্র দুর্বার সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের দ্বারাই সম্ভব। তাই এ আই ডি এস ও ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র পেশ করার জন্য সময় চেয়ে গত জুন মাস থেকে কয়েকবার মন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তার জবাব দেওয়ার সৌজন্যটুকুও মন্ত্রী দেখান নি। কিন্তু ছাত্র অভিযানের প্রচার ও প্রস্তুতি যত এগিয়েছে, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ছাত্রকর্মীদের নিরলস প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যকলাপের ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তার আঁচ পেয়ে পুলিশ বিভাগ নড়ে বসে, মন্ত্রীরও টনক নড়ে। ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় মন্ত্রী সাক্ষাতের সময় দেন। এ আই ডি এস ও সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে ৬ জন ছাত্রনেতার এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর সাথে দেখা করে দাবিপত্র নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী অর্জুন সিং আশ্বাস দিয়েছেন যে, ক্যাপিটেশন ফি সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ বাতিল করাবার জন্য সংসদের আগামী অধিবেশনেই তাঁরা বিল আনবেন। এছাড়া, জাতীয় শিক্ষানীতি 'রিভিউ' করার জন্য যে কমিটি হয়েছে, সেখানে ডিএসও'র পক্ষ থেকে সংশোধনী বা সংযোজনী দেওয়া হলে, তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।

বেলা ১১-৩০ নাগাদ রামলীলা ময়দান থেকে দশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত বিশাল মিছিল শুরু হয়। মিছিলের সামনে ছিলেন সর্বভারতীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ। মিছিলে সহস্রকণ্ঠের স্লোগান ওঠে, 'ক্যাপিটেশন ফি ব্যবস্থা বাতিল কর', 'শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ করা চলবে না', 'শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে', 'শিক্ষায় জ্যোতিষশাস্ত্র সহ কুসংস্কারের শিক্ষা চালু করা চলবে না।' মিছিল এগিয়ে চলে দিল্লির চওড়া রাজপথ ধরে সংসদ অভিমুখে। কেন্দ্রে নতুন ইউপিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দিল্লির বুকে এটাই সর্বভারতীয় প্রথম ছাত্রবিক্ষোভ মিছিল।

সংসদমার্গের ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রতাপ সামল, দেবাশিষ রায় ও অন্যান্য রাজ্যের ছাত্র নেতারা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হরিয়ানা রাজ্য শাখার সভাপতি কমরেড ওমপ্রকাশ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেডস্ বালেন্দ্র কাটিয়ার (উত্তরপ্রদেশ), দীপক কুমার (বিহার), রাজু শর্মা (রাজস্থান), মনজিৎ সিং (পাঞ্জাব), প্রকাশ দেবী (দিল্লি), মুকেশ সেমবল (গুজরাট), প্রমোদ কাম্বলে (মহারাষ্ট্র), বিশ্বজিৎ হারোড়ে (ছত্তিশগড়), রামঅবতার সিং (মধ্যপ্রদেশ) ও রমেশ (হরিয়ানা)। ছাত্র নেতারা বলেন, দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

ক্যাপিটেশন ফি

একের পাতার পর

বেতন অনেকখানি কমাতে ও বর্ধিত হোস্টেল চার্জ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

গত বছরেই তারা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেধা তালিকার ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করে কেবল টাকার জোর যাদের আছে তেমন ১০৫ জনকে ছাত্রপ্রতি ৯,২৪০০০ টাকা নিয়ে এসএসকেএম এবং মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রদের এইভাবে মেডিকেল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এ আই ডি এস ও মেডিকেল ইউনিটের পক্ষে ডাঃ মৃদুল সরকার ও ডাঃ চন্দন মণ্ডল আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম এত বেশি কেন

একের পাতার পর

আমাদের দেশে তেলের দাম প্রায় তার ডবল? — এ সব প্রশ্নের কী উত্তর সরকার দেবে?

কেন আমাদের দেশ আমদানি নির্ভর

একথা সত্য, আমাদের দেশ তেলের ক্ষেত্রে ক্রমাগত আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে। অথচ, '৭০-এর দশকের শেষের দিকে প্রয়োজনীয় তেলের ৭০ শতাংশ এদেশেই উৎপন্ন হতো। বর্তমানে উৎপন্ন হয় মাত্র ৩০ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০১০ সালে উৎপন্ন হবে মাত্র ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনীয় তেলের চাহিদার তুলনায় শতাংশের হারে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্রমাগত কমছে ও কমবে এবং আমদানি-নির্ভরতা বাড়ছে ও বাড়বে। কেন এমন হলো? এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না! এর রহস্য কী? এর উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস সরকারগুলোর গৃহীত নীতির মধ্যে।

স্বাধীনতার পরেও আমাদের দেশের তেলশিল্প ছিল বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। এইসব বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি তখন এদেশে নতুন নতুন তেলক্ষেত্র খুঁজে বের করার ব্যাপারে পুঁজি বিনিয়োগে একেবারেই উৎসাহী ছিল না, কারণ তাতে অতি দ্রুত উচ্চহারে মুনাফা ঘরে আসবে না এবং বিনিয়োগ করলেই নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা সে সময়ে ছিল না। তাই অনিশ্চিত পথে না হেঁটে ঐ সব বহুজাতিক তেল কোম্পানি বিদেশ থেকে তেল আমদানি করে এদেশে বিক্রি করত।

১৯৭০ সালে বিদেশি বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলির ব্যবসা এদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সাথে সাথে ও এন জি সি'র (অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) কাজকে সম্প্রসারিত করা হয়। এরপর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নতুন নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে বের করা হয় ও সেখান থেকে তেল উত্তোলন শুরু হয়। প্রায় সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর এ দেশ তেলের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে, দেশের প্রয়োজনীয় ১০০ শতাংশ তেলই শোধন করার ক্ষমতা অর্জন করে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে '৮৫ সালের পর। এই সময় রাজীব গান্ধীর সরকারের নেতৃত্বে তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়, যা আরও গতিবেগ অর্জন করে সিপিএম-বিজেপি সমর্থিত ভি পি সিং সরকারের আমলে। অবশেষে ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে এই পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের আমলে 'নয়া আর্থিক নীতি' গৃহীত হয়। উন্নয়ন ও আর্থিক পুনরুজ্জীবনের নামে এই কংগ্রেস সরকার লাভজনক সমস্ত শিল্প ও ক্ষেত্রগুলি দেশি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিতে থাকে। সিপিএম সমর্থিত দু'দফার যুক্তফ্রন্ট সরকারও একই কাজ করেছে। ফলে দেখা যায় বেসরকারীকরণের নিরবচ্ছিন্ন এই নীতির ফলে ১৯৯৬ সালেই ২৩টি তেল উৎপাদনকারী ব্লক দেশি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয় ও এন জি সি এবং অয়েল ইন্ডিয়াকে দুর্বল করে ফেলার কৌশলী পরিকল্পনা। যার ফলে তেল অনুসন্ধান ও তেল শোধন করার ব্যবস্থায় শ্লথতা দেখা দিল। (Instrument for exploration and refining of oil has tended to slow down'', EPW, 20-7-97) '৯৬ সালে নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দ ১১০০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়। এইসব পরিকল্পনা ও অন্য কয়েকটি বিষয় যুক্ত হয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ তেল উৎপাদন কমে যেতে থাকে। দেখা যায়, ৯৫-৯৬ সালে যেখানে এদেশে মোট অশোধিত তেল উৎপাদন হয়েছিল ৩৪.৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ৯৬-৯৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩১.৫৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। অর্থাৎ বিগত ৮ বছরে আভ্যন্তরীণ তেলের উৎপাদন এক ফোঁটাও বাড়েনি। তার আগের বছরগুলির সাথে তুলনা করলে বলা চলে — 'বরং কমেছে'। এর প্রধান কারণ তেলক্ষেত্রকে (Oil Sector) দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে পরিচালনা করা, যারা বেশি ও নিশ্চিত মুনাফার জন্য বিদেশ থেকে তেল কিনে এখানে বিক্রি করে। তাই বলা যায় অতি সুকৌশলে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে দেশকে আমদানি নির্ভর করে ফেলা হয়েছে এবং তা করেছে নানাবর্ণের শাসক রাজনৈতিক দল ও তাদের পরিচালিত সরকারগুলোই। এই হল তেলের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ার ইতিহাস।

আমদানি নির্ভরতাই কি বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ?

আমদানি নির্ভরতার জন্যই কি তেলের দাম বাড়ছে? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হল — না। আশ্চর্য মনে হলেও এটাই সত্য। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন — এটা কী করে সম্ভব? দেশের উৎপাদিত তেলের উৎপাদন খরচ যখন আমদানি করা তেলের দামের অর্ধেক বা কখনও কখনও অর্ধেকের কম, তখন আমদানি নির্ভরতা কমলে তো দেশে তেলের দাম কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমরাও মনে করি, তাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে আর তা হবে না; কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি। এই নীতির নাম হল ''ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি'', অর্থাৎ আমদানি মূল্যের সমান দাম। এই নীতি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে কেন? কারণ এর ফলে লাভবান হবে রিলায়েন্স, ইন্ডিয়ান অয়েলের মতো সরকারি বেসরকারি একচেটিয়া কোম্পানি। কেবল বিদেশি পুঁজিই নয়, ভারতীয় মাল্টিন্যাশানাল তেল কোম্পানিগুলিরও চাপ ছিল ''ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি'' চালু করার, যাতে দেশের তৈল সম্পদ ও কম উৎপাদন খরচের সুযোগ নিয়ে কম খরচে তেল তৈরি করে, আমদানি করা তেলের দামে বেচে তারা প্রভূত মুনাফা করতে পারে, যেটা তারা করছেও। এই দেশিবিদেশি মাল্টি-ন্যাশানালদের স্বার্থেই কেন্দ্রীয় সরকার 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি' চালু করেছে। অর্থাৎ দেশে উৎপাদিত তেলের খরচ যত কম হোক তা দেশের মধ্যেও বিক্রি করা হবে আমদানি করা তেলের সমান দামে। ফলে এখন আর দেশি তেল ও বিদেশি তেলের মধ্যে দামের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। কেন্দ্রের এই নীতির ফলে রিলায়েন্সের মতো দেশিয় একচেটে পুঁজি তেলের ব্যবসায়ে বিপুল মুনাফা করার সুযোগ পেয়েছে। যদি কোনদিন আমাদের প্রয়োজনীয় তেলের ৯৫ শতাংশও এদেশে উৎপন্ন হয়, আমদানি নির্ভরতা একেবারেই না থাকে, তা হলেও দেশিয় তেলের উৎপাদন খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে তেলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের বর্ধিত দামেই তা বিক্রি করে মুনাফা করবে। 'তেলের দাম এভাবে বৃদ্ধি করা চলবে না' বলে হুংকার ছেড়ে যে সিপিএম জনস্বার্থের চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাইছে — তারা কিন্তু এই একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে চালু করা 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি' নীতি প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা অনুরোধও করেনি। তাদের বহুঘোষিত অভিন্ন কর্মসূচিতে এই নীতির বিরুদ্ধে একটা শব্দও নেই।

তেল তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

আমাদের দেশের তেল তহবিলের জন্ম ১৯৭৫ সালে। এই তহবিলের উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, সমগ্র দেশে একটা দামে তেল ও তেলজাত দ্রব্য সরবরাহ করা (স্থানীয় লেভি ও সারচার্জ — যা রাজ্য সরকার ধার্য করে থাকে — সেগুলি বাদ দিয়ে)। দুই, পেট্রল ও গ্যাসোলিন লাভজনক দামে বিক্রি করে সেই টাকায় ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসে খানিকটা ভর্তুকি দেওয়া। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই তহবিল সবসময়ই উদ্বৃত্ত ছিল। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৮৯০০ কোটি টাকা (যা সুদে আসলে বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি)। সিপিএম সমর্থিত ভি পি সিং সরকার নানা অজুহাতে হিসাবের কারচুপি করে বাজেট ঘাটতি মেটানোর কাজে একে ব্যবহার করেছে। তেল তহবিলের টাকা আত্মসাতের এই ছিল শুরু।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৫ সাল থেকেই তেল শিল্পের বিকাশের নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে উৎপাদিত তেলের উপর বিশেষ ধরনের একটা সেস বসাতে শুরু করে (দু'হাজার দু সালের মার্চ মাস থেকে এই সেসের পরিমাণ টন প্রতি ১৮০০ টাকা)। এ পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে যে টাকা আদায় করেছে সুদে আসলে তার পরিমাণ হল কমবেশি এক লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এ পর্যন্ত তেলশিল্পের উন্নয়নে খরচ করা হয়েছে মাত্র ৯০২ কোটি টাকা। এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা, ১৯৮৩-৮৪ থেকে ৮৭-৮৮ এবং ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত তেলশিল্পের উন্নয়নে এই খাত থেকে একটা টাকাও খরচ করা হয়নি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন করে প্রায় ৯৯ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এবং এই কাজ কংগ্রেস সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট এবং বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকার — সবাই করেছে। ২০০২-০৩ সালে এ দেশের তেল আমদানির খরচ ছিল ৮৫,০৪২ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৩,১৫৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১ বছরে খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ ৮,১১৭ কোটি টাকা। অতি সহজেই এই টাকা তেল তহবিল থেকে মিটিয়ে দেওয়া যেত এবং মিটিয়ে দেওয়ার পরও তেল তহবিলে আরও ৯১ হাজার কোটি টাকা থাকত। তাহলে সত্যিই কি বারবার তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি করার প্রয়োজন হত? আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধির কথা তুলে যাঁরা বলছেন — 'সরকার নিরুপায়, সরকারের কিছু করার নেই' — তাঁরা সত্যের অপলাপ করছেন নাকি?

দামবৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক বাজারের দামবৃদ্ধি ছাড়াও তেলের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর নীতির ভূমিকাও অনেকখানি। এবার সে প্রসঙ্গ দেখা যাক। আন্তর্জাতিক বাজারে যে দামবৃদ্ধি নিয়ে এত হইচই করা হয় — সেই দাম প্রকৃতপক্ষে কত? জুন, ২০০৪ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ দাম ছিল ব্যারেল প্রতি (১ ব্যারেল = ১৫৮.৬ লিটার) ৩৫ ডলার (১ ডলার = ৪৫.৪৬ টাকার কাছাকাছি)। তারপর থেকে এই দাম বাড়তে বাড়তে এই লেখার সময় ৪২ ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দামকে যদি আমরা হিসাবে ধরি তাহলে ১ লিটার অশোধিত তেলের দাম দাঁড়ায় প্রায় ১২ টাকা ২৫ পয়সা। পশ্চিম এশিয়া থেকে মুম্বাই বন্দর পর্যন্ত পরিবহন খরচ ব্যারেল প্রতি ১.২৮ ডলার। শোধনের খরচ ব্যারেল প্রতি ১.৫০ ডলার (মনে রাখতে হবে এদেশে শোধনের খরচ আন্তর্জাতিক বাজারের অর্ধেক বা কখনও কখনও তারও কম)। তাহলে পরিবহন ও শোধনের জন্য খরচ দাঁড়ায় ব্যারেল প্রতি সর্বমোট ২.৭৮ ডলার। অর্থাৎ লিটার প্রতি মাত্র ৮০ পয়সা। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাজারে ৪২ ডলার ব্যারেল দরে তেল কিনে পরিবহন ও শোধন করে ভারতে শোধিত তেলের দাম দাঁড়ায় ১২.২৫ + .৮০ = ১৩.০৫ টাকা লিটার। এর উপর যুক্ত হবে ২০ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক অর্থাৎ আরও ২.৫০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি লিটার সর্বমোট ১৫.৫৫ টাকা। মনে রাখতে হবে, এই যে লিটার প্রতি ২.৫০ আমদানি শুল্ক আমাদের দিতে হচ্ছে তা কিন্তু সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে না। এই টাকা দিয়ে তেলশিল্পের মালিকদের ভরতুকি দেওয়ার নামে পকেট ভরানো হয়। এই তহবিল থেকে গত বছর রিলায়েন্স কোম্পানিকে সরাসরি দেওয়া হয়েছে ২০০০ কোটি টাকা।

প্রতি লিটার পেট্রলের আমদানি খরচ (১ ব্যারেল = ৪২ ডলার)

তাহলে প্রতি লিটার পেট্রলের আমদানি খরচ কত? দেখা গেল—

অশোধিত তেল	১২.২৫ টাকা
পরিবহন খরচ	০.৩৭ পয়সা
শোধন খরচ	০.৪৩ পয়সা
আমদানি শুল্ক	২.৫০
মোট	১৫.৫৫ টাকা

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারদরের সর্বোচ্চ দামে তেল কিনে শোধন ও পরিবহন খরচ ধরে এক লিটার পেট্রলের দাম পড়তে পারে (আমদানি শুল্ক বাদ দিয়ে) বড় জোর ১৩.০৫ টাকা। অথচ এই তেলই আমাদের বাজার থেকে কিনতে হয় ৩৯.৯১ টাকায়। তাহলে এই দামবৃদ্ধির কারণ কী? কেন লিটার প্রতি বাড়তি আরও ২৬.৮৬ টাকা আমাদের নগদ গুণে দিতে হয়? এর একটাই উত্তর — আমদানি শুল্ক ছাড়াও পেট্রল ডিজেল দুইয়ের ওপরে রয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর। অর্থাৎ তেলের দামের থেকে এদের বসানো মিলিত কর দ্বিগুণেরও বেশি। তাই কোন দ্বিধা না রেখেই এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া যায় তেলের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কর নীতি।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন বুর্জোয়া দল এই ধরনের করের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপাবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এটাই ওদের চরিত্র। ওদের এই চরিত্র বুঝতে সংগ্রামী সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অসুবিধা হয় সিপিএম এবং তার রাজ্য সরকারের ভূমিকা বুঝতে। কারণ, তাদের চরিত্র দ্বিমুখী। তেলের মূল্যবৃদ্ধি হলে তারা বিরোধিতার ভান করে, আবার সেই সুযোগে বিক্রয়করের বর্ধিত বোঝা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাসভাড়া বাড়ানোর জন্য বাসমালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে যায়। আমরা আগেই বলেছি — তেলশিল্পকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া বা দেশে উৎপাদিত তেলের দাম আমদানিকৃত তেলের দামের সাথে এক করে দেওয়া ইত্যাদি প্রতিটি পদক্ষেপকেই সিপিএম কখনও নীরব থেকে কখনও বা নামমাত্র বিরোধিতা করে প্রকারান্তরে মূল্যবৃদ্ধি বাস্তবায়িত হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাদের জনবিরোধী চরিত্রের এটুকুই সব নয়। **সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার তেলের উপর বিক্রয় কর বসিয়েছে ২৫ শতাংশ, যা ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে বেশি। পাশের রাজ্য আসামে এই করের হার ১২ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ২০ শতাংশ।** অর্থাৎ, বুর্জোয়া দল পরিচালিত সরকার তেলের উপর যতটা বিক্রয় কর বসিয়েছে, 'প্রগতিশীল' সিপিএম সরকার বসিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পেট্রল-ডিজেলের উপর রাজ্য সরকারের বসানো লিটার প্রতি ১ টাকা সেস। এর ফলে ঝাড়খণ্ড বা আসাম থেকে আমাদের রাজ্যে তেলের দাম লিটার প্রতি দু থেকে সাড়ে তিন টাকা বেশি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গবাসী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুগপৎ আক্রমণে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তেলের দাম গুণে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সম্প্রতি দু'দফায় তেলের দাম

আটের পাতায় দেখুন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

এফ বি আই-এর সহায়তার প্রস্তাব অত্যন্ত বিপজ্জনক

— নীহার মুখার্জী

আসাম ও নাগাল্যান্ডে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলা করার জন্য কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের (এফ বি আই) সহায়তা দেওয়ার যে প্রস্তাব মার্কিন রাষ্ট্রদূত দিয়েছেন, তাতে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৬ অক্টোবর একটি প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন। কমরেড মুখার্জী বলেছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাক গলানোই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং যেখানে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে বিভেদকামী, পৃথকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে মার্কিন মদতের কথা সুবিদিত, সেখানে এ জিনিস আরও গভীর বিপদের সঙ্কেত বহন করছে। অতএব এই প্রস্তাব এখনই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

কমরেড মুখার্জী আরও বলেন, কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান ইউ পি এ সরকার বিজেপি পরিচালিত পূর্বতন এন ডি এ সরকারের মতোই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করে চলেছে বলেই মার্কিন প্রশাসন এরকম একটি ঘৃণ্য প্রস্তাব দেওয়ার সাহস দেখাতে পেরেছে। কমরেড মুখার্জী ক্রমবর্ধমান এই ধরনের বিপজ্জনক প্রবণতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কমরেড মুখার্জী উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট সকলকেই, সাধারণ পুরুষ, নারী ও শিশুদের নিরর্থক রক্তপাত ঘটানো থেকে বিরত হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন, কারণ তা সমস্ত অংশের মানুষের জীবনে শুধুমাত্র ধ্বংসই ডেকে আনে। সরকারের কাছে তিনি জোরালো দাবি জানিয়ে বলেছেন, আসাম ও নাগাল্যান্ডের জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে, সাথে সাথে জনগণের ন্যায্য ক্ষোভ-বিক্ষোভগুলির দ্রুত উপযুক্ত মীমাংসার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

এস এফ আই-এর হাতে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

ডি এস ও'র চাপে দুষ্কৃতীরা সাসপেন্ড

হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর উপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি এতই ঘৃণ্য যে ছাত্রীটি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে পারেনি। এই লজ্জাজনক ঘটনার জন্য ছাত্রীটি সরাসরি ঐ কলেজের এসএফআই ছাত্র সংসদের নেতাদের দায়ী করেছে। আরও দুঃখজনক হল এসএফআইয়ের ছাত্রী কর্মীদের আচরণ। তারা ঘটনার সময় শুধু উৎসাহই দেয়নি, খবরে প্রকাশ, এই নোংরামিতে সহায়তাই করেছে। সিপিএমের রাজনীতি আজ তাদের ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের মধ্যেও কী চরম নৈতিক অধঃপতন ও অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে এই ঘটনা তারই একটি জঘন্য নমুনা।

এই ঘটনায় অভিযুক্ত এসএফআই নেতাদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে এক ধিক্কার সভা করা হয় এবং সেখান থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ধিক্কার সভায় ডিএসও নেতারা বলেন, এসএফআই-এর ছাত্রী কর্মীরা মেয়ে হয়ে আরেকটি মেয়ের উপর যৌন নিগ্রহে উৎসাহ দিয়ে মহিলাদের মর্যাদাকে কোথায় নামালেন, তা ভেবে দেখেছেন কি? তাঁরা বলেন, এভাবেই এসএফআই পশ্চিমবাংলার কলেজে কলেজে বিরোধী সংগঠনের ছাত্রছাত্রীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালায়, ভয় দেখায়, হয়রানি করে, মেয়েদের কলেজে এসে ছেলেরা হামলা চালায়, মেয়েদের বাড়ি বাড়ি হুমকি দেয় এবং এই প্রক্রিয়াতেই বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়ে ইউনিয়ন দখল করে। একজন ছাত্রী যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই অপর ছাত্রছাত্রীদের হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়, তাহলে আমাদের দেশে সাধারণ মহিলাদের নিরাপত্তা কতটুকু? এই ঘটনা মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

ডিএসও কর্মীরা যখন অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রেলওয়ে প্লাটফর্মে প্রচার করছিল, সেইসময় বহু ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ নাগরিক এস এফ আই-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও ধিক্কার জানান। প্রবল জনবিক্ষোভের আঁচ পেয়েই এসএফআই-এর জেলা নেতারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ঐ কলেজের এসএফআই নেতারা এই ঘটনার জন্য দায়ী। অবশেষে সংবাদে প্রকাশ, আন্দোলনের চাপে রাজ্যের টেকনিক্যাল এডুকেশন অব স্কুলস-এর ডিরেক্টরের নির্দেশে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ অভিযুক্ত ১২ জন ছাত্রছাত্রীকে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করেছেন।

উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ

পাঁচের পাতার পর

খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দিবসকে পালন করা হয় সংকল্প দিবস হিসাবে, ডাক দেওয়া হয় — 'কলকাতা চলো'। ৫ অক্টোবর রাজধানী কলকাতায় দাঁড়িয়ে তাঁরা সরকারকে জানিয়ে দিলেন — দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই চলবে। চা-শ্রমিক নেতা শংকর গাঙ্গুলী রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এরা এতটাই অমানবিক যে, অনাহারে নয়, অপুষ্টিতে মারা গেছে বলে এবং তার সপক্ষে অ্যাকাডেমিক যুক্তির অবতারণা করে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চায়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র রাজ্য নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, চা-শিল্পে উৎপাদনভিত্তিক মজুরি চালুর চক্রান্ত প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিকদের প্রস্তুত হওয়ার আবেদন জানান। রাজ্য সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা প্রবল বর্ষণের মধ্যেও অবিচলভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমাদের সংগঠনের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে এই শক্তির উৎস।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড তপন ভৌমিক, অভিজিৎ রায়, গোপাল খেস, কাজী লামা প্রমুখ।

শিশুমৃত্যুও মন্ত্রীদের বিচলিত করে না

ছয়ের পাতার পর

এক্ষেত্রে তীব্র অক্সিজেন ঘাটতিতে ভোগার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা না গেলে শিশুমৃত্যু ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত, সদ্যোজাত শিশুদের মৃত্যুর বড় কারণ হচ্ছে 'হাইপোথার্মিয়া'। এতে শরীরের তাপ বেরিয়ে যায়। এটা আটকানোর জন্য সেই শিশুদের 'রেডিয়েন্ট ওয়াটারের' মধ্যে রাখতে হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য ওয়াটার অচল হয়ে পড়লে শিশুমৃত্যু ঘটবেই। অথচ, এতদ্‌সত্ত্বেও কোনরকম তদন্ত না করেই স্বাস্থ্য দপ্তরের রায় — 'বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সাথে শিশুমৃত্যুর কোনও সম্পর্কই নেই।' এটা কি যেনতেন প্রকারে নিজেদের গাফিলতি ঢাকা দেওয়ার প্রয়াসই নয়? ইতিপূর্বে এই হাসপাতালেই নিজেদের অপদার্থতায় শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে আড়াল করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এ তো স্বাভাবিক মৃত্যু। আমলাশোল ও দার্জিলিং চা বাগানে মানুষের অনাহারে মৃত্যুকে ওরা বলেন, অনাহার নয়, অপুষ্টি বা অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়েছে। মহিলা ধর্ষিতা হলে ওরা অপরাধীদের দোষ হালকা করতে ধর্ষিতা মহিলার উপরেই দোষ চাপান। বলেন, মহিলার চরিত্র খারাপ ছিল। নিজেদের অপদার্থতা অকর্মন্যতা ঢাকবার এ এক নির্লজ্জ অপকৌশল।

এখন প্রশ্ন তো উঠবেই। হাসপাতালের মত এরকম জরুরী পরিষেবা ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনও বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়নি কেন? এই প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র, এ ব্যাপারে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২৯ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সিইএসসি'র সাথে কোনরূপ যোগাযোগই করা হয়নি। অর্থাৎ সরকারি দপ্তরের আর পাঁচটা গতানুগতিকতার পথে এই প্রতিশ্রুতিও ধামাচাপা পড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

আর এখানেই এসে পড়ে এক গভীরতর প্রশ্ন। সদ্য সন্তানহারা সাধারণ বাবা-মায়ের বুকফাটা কান্না এই সরকার ও প্রশাসনের বধির কানে আদৌ প্রবেশ করবে তো? নাকি তাঁরা মাটির পৃথিবী থেকে অনেক উপরের কোনও গজদন্ত মিনারের বাসিন্দা, যেখানে মাটির কাছাকাছি মানুষজনের দুঃখ-ব্যথা-বেদনাজনিত কান্নার ক্ষীণতম আর্তস্বরের কোনও প্রবেশাধিকার নেই। শুধু যখন কোনও ব্যাপারে খুব হইচই হয়, তখন তড়িঘড়ি কিছু প্রতিশ্রুতি বর্ষণ করে, কিছু তদন্ত কমিটি গঠন করে, কখনও বা চরম অবজ্ঞায় এমনকি সে পথও না মাড়িয়ে, সবকিছু চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাই এতবড় একটা হৃদয়বিদারক ঘটনায়ও তাদের প্রতিক্রিয়ায় থাকে না লেশমাত্র আন্তরিকতার কোনো ছোঁয়া। আর আশ্চর্য পরিহাস হল এই যে, এরাই আবার ঢাক পেটায় — এই প্রশাসন, এই সরকার নাকি সংবেদনশীল, গরিব ও সাধারণ মানুষের বন্ধু!

গণবিক্ষোভ

২৭ সেপ্টেম্বর রাত ৩টা থেকে ভোর ৫-৩০মিঃ পর্যন্ত নারকেলডাঙ্গায় বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সংবাদ পাওয়ামাত্র ভোর সাড়ে চারটেতেই ছুটে আসেন এস ইউ সি আই কাঁকুড়গাছি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির আঞ্চলিক শাখার সভাপতি কমরেড অজয় চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে মৃত শিশুদের আতঙ্কিত অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় মানুষ জড়ো হয়েছেন হাসপাতাল চত্বরে। কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতির প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাঁরা কমরেড অজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে নারকেলডাঙ্গা মেন রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের উপর নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে এবং কমরেড অজয় চক্রবর্তী সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। হাসপাতালে বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বা জেনারেটর দুরস্থান, একটি মোমবাতিও সময়মত জ্বলেনি। দোষীদের গ্রেপ্তার না করে অভিভাবকদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এবং ধৃতদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। ইতিমধ্যে উপস্থিত হন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সদস্য ডাঃ মতিলাল গিরি, ডাঃ শান্ত মণ্ডল, ডাঃ পবন সাউ ও স্বাস্থ্যকর্মী মধুসূদন দোলুই। মৃত শিশুদের সংখ্যা বা তাঁদের সম্পর্কে কোন তথ্য যাতে কেউ জানতে না পারে তারজন্য নজিরবিহীন পুলিশি ঘেরাটোপের ব্যবস্থা করেন হাসপাতাল সুপার। এমতাবস্থায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি, মৃতদের যথোচিত ক্ষতিপূরণ, সর্বক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, অন্যথায় বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে বিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে ওঠে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপর পুলিশি হেনস্থার ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। অবশেষে প্রবল বিক্ষোভের চাপে পুলিশ ধৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর দেন কয়েক হাজার মানুষ। পূর্বে অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সুপার অতিশয় দুর্ব্যবহার করেন। প্রতিবাদে স্মারকলিপি জমা না দিয়েই প্রতিনিধি দল ফিরে আসেন। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ডাকে বিকালে ফুলবাগানে জনসভা হয়।

দাম এত বেশি কেন

সাতের পাতার পর

বাড়ানোর পরও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির যুক্তি দিয়ে আবার মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব তোলা হলে, জনরোষের আশঙ্কায় সরকার ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়, যাতে দেশের বাজারে আগের দামেই তেল বিক্রি সম্ভব হয়। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, সরকার চাইলেই আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেশের মানুষকে কম দামে ডিজেল-পেট্রল দিতে পারে।

তাই একথা পরিষ্কার, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যদি তেলের উপর বসানো তাদের নানা করের ২৫ শতাংশও হ্রাস করে তাহলেই বর্তমান দামের তুলনায় লিটার প্রতি দাম কমে যেতে পারে ৬.৫০ টাকা। কিন্তু এই কাজ না করে নানা সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন একদিকে তেল তহবিলের দেড় লক্ষ কোটি টাকা অন্য খাতে সরিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবায় তা ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে দরবৃদ্ধির অজুহাতে তেলের দর বাড়িয়ে দিয়ে কর বাবদ সরকারের আয়টাও বাড়িয়ে নিচ্ছে, এরই সাথে অস্বাভাবিক করবৃদ্ধির জনবিরোধী চরিত্রকে আড়াল করতে 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামবৃদ্ধি' বা 'আমদানি নির্ভরতা' ইত্যাদির ধুয়ো তুলছে। আর 'বামপন্থার' তকমা গায়ে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর এই কুকর্মের শরিক হয়েছে সিপিএম। তাই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এদের সকলের বিরুদ্ধেই।

আগামী ২২ ও ২৯ অক্টোবর গণদাবী প্রকাশিত হবে না।
পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৮ নভেম্বর।
সম্পাদক, গণদাবী

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net